বহুরূপী প্রসঙ্গে

দীপঙ্কর দাস

গাজনের সঙ্গে মুখ চিত্রিত করার রেওয়াজ আছে। বিশেষ করে নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে প্রচলিত সঙ, বোলান গান নামে যার পরিচিতি, গান শুর আগে বোলানের লোকেরা কুমোর পাড়ার হাজির হয় এবং কুমোরেরা তাদের মুখ চিত্রিত করে দেন। এছাড়া চরিত্রানুগ মুখোশও পরিধান করা হয়। কিন্তু মুখোশ ব্যবহার না করে মুখচিত্রণ করে নর্তকেরা। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়া এবং বর্ধমান জেলায় সাজার রীতি এখনো ব্যাপক। তবে শুধু মুখচিত্রণ নয়, জটা ও চরিত্রানুগ পোশাক, ত্রিশূল ইত্যাদি আভরণও ব্যবহার করা হয়। এই মুখ চিত্রণ, মুখোশ ধারণ অবশ্যই জাদু ভিত্তিক এবং জাদু বিশ্বাস, মর্গানবৃত যুগবিভাগে বর্বরতার পর্যায় থেকেই প্রচলিত। ভূতনাথ শিবের জুটি বিধানের জন্য সঙ সাজা ও নাচা হয়। পৃথিবীর সর্বপ্রান্তেই অপদেবতার তুষ্টি বিধানের জন্যে মুখোশ পরে নাচা এবং ক্ষেত্র বিশেষে মুখচিত্রণের রীতি আছে। বিশেষ করে আফ্রিকার উপজাতিগুলির মধ্যে মুখচিত্রণের আধিক্য পরিলক্ষিতহয়। কাজেই মর্গানের বিশ্লেষণ, যুক্তিসিদ্ধ সাধারণ সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বহুরূপী বৃত্তিধারী লোকশিল্পীদের দেখা পাওয়া যায়, জম্মু, পাঞ্জাব,উত্তরপ্রদেশে , রাজস্থান, বিহার। অখন্ডিত বাংলা ও ত্রিপুরায় একসময় বহুরূপীর ব্যাপক চর্চা ছিল। তিববতেও বহুরূপীর অস্তিত্ব আছে। আইন-ই আকবরীতে বহুরূপীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় ষোড়শ শতকে এই বৃত্তিটির যথেষ্ট কদর ছিল।

বহু বিচিত্র রূপ ধারণ করে মনোরঞ্জন করা বহুরূপী বৃত্তির বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক জাদুবিশ্বাস থেকে মুক্ত স্বতন্ত্র লোকশিল্প হিসেবে এই বৃত্তির প্রচলন কিভাবে হয়েছিল বলা শক্ত। ভারতবর্ষে সাধারণত শবর সম্প্রদায়ের লোকেদের এই বৃত্তি অবলম্বন করতে দেখা গেছে। গোড়ায় শবরদের একটা অংশ যাযাবর ছিল, তারা মধুসংগ্রহ, পাখি শিকার, ভেষজ ঔষধ বিক্রয় ইত্যাদি কার্যের সঙ্গে বহুরূপীও সাজত। পরে উপজাতিক বন্ধন শিথিল হয়ে একটি সংহত বৃত্তিধারী লোকসমাজ হিসেবে গড়ে ওঠে। হুগলী জেলায় আখড়া গ্রামে এখনও ৫০ পরিবারের সংহত বহুরূপী পল্লী বর্তমান। পশ্চিম মেদিনীপুরের ফুটপাল, নারায়ণপুর, শিলদা, বেলপাহাড়ীতে বহুরূপীদের সংহত বসত ছিল। বর্তমানে পেটের দায়ে এরা ব্যাপকভাবে জীবিকা ত্যাগ করেছেন।

বাংলায় বহুরূপীদের সাধারণত পুরাণাশ্রিত চরিত্র রূপায়ন করতে দেখা যায়, কালী, শিব, রাম, কৃষ্ণ, ইত্যাদি। দু চারটি লোকায়ত চরিত্র, গোয়ালিনী, ক্ষেপী, সাহেব। পশু চরিত্র, হনুমান, বাঘ, সিংহ। শরৎচন্দ্রের ছিদাম বহুরূপীর কথা স্বতই মনে পড়বে। কিন্তু বহুরূপী কখনোই ভাঁড় নয়, ইউরোপীয় জোকারও নয়। এরা সিরিয়াস চরিত্র। মুখচিত্রণ, মুখোশ, জটা, লেজ, জিভ, আলখাল্লা, পুঁতির মালা, ত্রিশূল, খড়্গ, ইত্যাদি প্রকরণে এরা সিদ্ধ। বহুরূপী সর্বত্রই একক চরিত্র। সাধারণত মৌনি, কদাচিৎ দু একটি সংলাপ বলে বা চরিত্রানুগ হুঙ্কার ছাড়ে। অর্থাৎ বহুরূপী মূলত প্রদর্শমূলক শিল্প, অভিনয় সংপৃক্ত নয়। তবে বাংলার বাইরে এই শিল্পরীতির কিছু বিবর্তন দেখা যায়। একই লোক মুখের দুপাশ দুভাবে, অর্থাৎ নারীও পুষভাবে চিত্রিত করে, মস্তকাবরণ দক্ষহাতে সরিয়ে দুরকমরূপ প্রদর্শনকরে, দুরকম কণ্ঠে সংলাপও বলে। বাংলায় কালীকৃষ্ণ অর্থাৎ যে কালী সেই কৃষ্ণ এবং অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি মুখের দুদিকে দুভাবে চিত্রিত হলেও মস্তকাবরণ পালটাবার রীতি নেই, সংলাপও নেই। অর্থাৎ বাংলার বাইরে বহুরূপী লোকনাট্যের রূপ নিতে চলেছে। বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাসে, এক নাটুয়ার কৃষ্ণ সেজে সংলাপ বলার বিবরণ আছে। সম্ভবত বহুরূপীর একটি স্থানিক রীতি হিসেবেই ওর প্রচলন। মেদিনীপুরে ভাঁড় যাত্রায় একই লোকের বিভিন্ন চরিত্র সজ্জায় এবং কণ্ঠবিকৃত করে অভিনয় প্রদর্শনের রীতি আছে তবে তা আসর সাজিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহকারে পরিবেশন করা হয়, স্বতন্ত্র পালা অবলম্বন করে। বহুরূপী থেকে ভাঁড়াযাত্রা স্বতন্ত্র এবং সঠিকভাবেই নামাঙ্কিত। বহুরূপী প্রদর্শে গীত বাদ্যের কোন ব্যবহার নেই। তবে পায়ে ঘুঙুর পরার রীতি আছে।

বাংলায় সারা বছর বহুরূপীর দেখা মিলত না, সাধারণত বর্ষার রোয়া পোঁতার শেষে অর্থাৎ শরৎকালে এবং ফসলওঠার পরে অর্থাৎ শীতের সময় এরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত। এক একজন, এক এক গ্রামে ঘাঁটি নিয়ে সাধারণত ৭ বা ১০ দিন ধরে বিভিন্ন রূপ প্রদর্শন করে, পার্বনী অর্থাৎ নগদ অর্থ, কাপড়, চাল - ডাল, নুন - তেল, ইত্যাদি পাওনা গণ্ডা বুঝিয়ে নিয়ে অন্য গ্রামে পাড়ি দিত। রূপ প্রদর্শনের রীতি ছিল এরকম, কই গো মাঠাকনেরা বাইরে আসুন, বহুরূপী দর্শন কন। কখনো বা বাঘ সেজে হুঙ্কার দিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াতে। ঘুঙুরের ব্যবহারও দর্শক আকর্ষণের জন্য। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এইভাবে বলতো রূপ দর্শানোর পালা। কালীসাজে মৌনি, কারণ কাঠের ভিজে মুখ বন্ধ। কখনো মুখ আঁধারির সময় গেরস্থ মেয়েরা আঁতকেও উঠেছে। বাড়ি বাড়ি ঘোরার সময় পিছু নিত একপাল ছেলে মেয়ে। শেষের দিনে পার্বনী তোলার সময় গেরস্থ মেয়েরা বলতো সামনের বছর আবার এসো বাপু।

কিন্তু দিন বদলেছে, গ্রামেও এখন টিভি, ভিডিও, ভিসিআর এ ছমছমাছম হিন্দি ফিল্মের নাচ দেখা যায়। বহুরূপীর রূপ দেখতে আর কেউ আগ্রহী নয়, বহুরূপীরা ভিখারির পর্যায়ে নেমে এসেছে। ফলে ব্যাপক পেশা ত্যাগএবং লোকায়ত শিল্প ধারাটি লুপ্ত হতে বসেছে। তবে টিভির কল্যাণেই শহুরে দর্শকের কপালে কদাচিৎ বহুরূপীর দর্শন লাভ ঘটে।

বহুরূপীদের একটি প্রান্তিক পেশা হিসেবে একসময় ঘোড়ানাচের প্রচলন হয়েছিল। এদের মধ্যে একদল ঘোড়া সেজে নাচ দেখাতো। কাঠের তৈরি একটা কাঠামো কোমরে বেঁধে নাচ হয়। কাঠের একটা ঘোড়ামুখ কোমর থেকে উদ্ধত থাকে, ঘাঘরা মত একটা বস্ত্র বেষ্টনী লম্বিত থাকায় নাচিয়েকে ঘোড়সাওয়ারের মত দেখায়। কোনরকম বাদ্যসঙ্গম ছাড়াই, বা কখনো ঢোলোকের সঙ্গত সহ এরা বিশ পঁচিশ মিনিট বা আধঘন্টা কল্পিত ঘোড়ার চালে এমনভাবে নাচে, যাতে মনে হয়, একজন ঘোড় সওয়ার চলেছে। যদিও এটি নাচ, রূপপ্রদর্শন নয়, তবু একে বহুরূপী রূপ বিবর্তন গণ্য করতে হবে।

পেশাটি লুপ্ত হতে চলেছে অনাদরে অবহেলায়। কিন্তু লোকশিক্ষার কাজে একে অনায়াসেই লাগানো যায়, তার জন্যে হয়তো সংলাপ যুক্ত ক্ষুদ্র পালার প্রচলন দরকার হবে, যেমন বোলান গানে করা হয়। অধনা পটুয়াদের এরকম ব্যবহার শু হয়েছে। বহুরূপী পেশাটিকেও এভাবে বাঁচানো যেতে পারে। অন্যথায় ডোডোপাখির

অবলুপ্তির আগেই পূণাঙ্গ তথ্যচিত্র নির্মাণ ও লিখিত বিবরণ, শিল্পচর্চায় কেন্দ্রগ্রাম ও শিল্পীদের চিহ্নিত করে মানচিত্র প্রস্তুত করা দরকার। বহুরূপীদের বিষয়ে নিবিড় অনুসন্ধান থেকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে নতুন দিগদর্শনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com